Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 65
Website: https://tirj.org.in, Page No. 586 - 595
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 586 - 595
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

পুরাণ ও আধুনিকতার মেলবন্ধন : বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক

মনীষা পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া
Email ID : monishapal870@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Buddhadeb Bose, poetic drama, Topossi Torongini, Kalsondhya, Anamni Angana, Prothom Parttha, Songkranti,

Abstract
Buddhadeb Bose is a groundbreaking name in Bengali drama literature. He enriched Bengali literature by composing plays in different styles. Mahabharata-centered poetic dramas written almost at the end of his life are one of the signs of his theatrical talent. In these poetic dramas based on Indian mythology, the playwright has adapted the mythology to his own liking. He has mixed with that story the modern people's thinking. In the dramas, he took refuge in his own imagination by taking mythological stories. Above all, his artistic genius has made the dramas, though ancient, suitable for the modern mind.

Discussion

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যকে যিনি সব থেকে বেশি আপন ও সমৃদ্ধ করেছেন তিনি হলেন বুদ্ধদেব বসু। তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার প্রাণপুরুষ। তবে তাঁর লেখনী বাংলা সাহিত্যকে শুধু কবিতা উপহার দিয়েছে এমন নয়; নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, অনুবাদ ও শিশুসাহিত্য রচনায়, বলা যায় সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শুরু হয় নাটক রচনার মধ্য দিয়ে। নাটকের প্রতি আকর্ষণ তাঁর ছোটবেলা থেকেই। ছেলেবেলায় নোয়াখালীতে থাকাকালীন তাঁর মাতামহ তাঁকে শেক্সপিয়ার, বার্নাড শ প্রমুখের নাটক সম্পর্কে অবহিত করাতেন, পরিচিত করাতেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং অন্যান্য প্রতিভাধর নাট্যকারের নাটক সম্পর্কে। এই নাট্যচর্চা বাল্যকাল থেকে তাঁর মনে নাট্যপ্রেমকে জাগিয়ে তুলেছিল। নোয়াখালী টাউনহলের স্থানীয় যুবকদের সৌখিন নাট্যাভিনয় তাঁকে মুগ্ধ করত। ছাত্রাবস্থা থেকে এই নাটক দেখা ও অভিনয় তাঁকে পেয়ে বসেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন সেই সময়ের পক্ষে অতি আধুনিক দুটি একাঙ্কিকা লিখেছিলেন। একাঙ্কিকা দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে অভিনীত হয়েছিল। তিনি যখন ঢাকা থেকে কলকাতা আসেন তখন তাঁর একমাত্র অভিপ্রায় ছিল 'নাট্যকার' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু অর্থ উপার্জনের জন্য তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প, শিশু-সাহিত্য রচনাও করেছিলেন। নাটক, কবিতা বাদে তাঁর সে সমস্ত রচনাও বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল।

বুদ্ধদেব বসু নাটক রচনার পাশাপাশি সমগ্র জীবন ধরে নাটকের ফর্ম নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। ফলস্বরূপ তাঁর লেখনী আমাদের উপহার দিয়েছে বিভিন্ন আঙ্গিকের নাটকধর্মী রচনা। ১৯৩৩ সালে আমরা তাঁর নাটককে

এক নতুন আঙ্গিকে পাই। তিনি সে রচনার নাম দিয়েছিলেন 'নাট্যোপন্যাস'। এটি সম্পূর্ণরূপে নাটকের ফর্মে লেখা সংলাপ সর্বস্ব একটি উপন্যাস। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত 'ঘরেতে ভ্রমর এলো' ছোটগল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'লোকটা' নামক রচনাটি নাটকের ফর্মে লেখা একটি ছোটগল্প। রীতিমতো অভিনয়যোগ্য এই গল্পনাট্যটি তাঁর নাটকের আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার আরেকটি সুখপাঠ্য উপহার। চল্লিশের দশকে উপহার দিয়েছিলেন দুটি গদ্যনাটক, একটি মৌলিক 'কাঠঠোকরা' অপরটি তাঁর 'কালো হাওয়া' উপন্যাস অবলম্বনে রচিত পূর্ণদৈর্ঘ্যের নাটক 'মায়া মালঞ্চ'। এরপর তিনি নাট্য রচনায় দীর্ঘদিন বিরতি দিয়ে পুনরায় ষাটের দশকে ফিরে আসেন 'পাতা ঝরে যায়' এবং 'বাবু ও বিবি' নামক দুটি একাঙ্ক নিয়ে। এই দুটি একাঙ্কই পূর্বের রচনা 'লোকটা'র আঙ্গিকে রচিত, অর্থাৎ এ দুটিও গল্পনাট্য। পরবর্তীতে তিনি এই রচনা দুটিকে যুক্ত করেছিলেন আনন্দ থেকে প্রকাশিত তাঁর ছোটগল্পের সংকলন 'তুমি কেমন আছো' গ্রন্থে। এই সময়ে তিনি যাদবপুর ও আমেরিকায় অধ্যাপনার কাজ সমাপ্ত করে পুনরায় নাট্যরচনায় মনোনিবেশ করেন। পাঠককে উপহার দেন বেশ কয়েকটি অসাধারণ নাটক। নাটক রচনার নিত্য নতুন আঙ্গিক নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি এই সময় তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তাঁর মহৎ গ্রন্থ 'মহাভারতের কথা' লেখার। স্বভাবত তখন লেখকের মন জুড়ে ছিল মহাভারত। তাই এই সময় নাটকের আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য সম্পাদনের প্রয়াসে ও লেখকের কবি-নাট্যকার সত্তার মিলনে যে কয়েকটি অসাধারণ কাব্যনাট্য বাংলা সাহিত্যে সংযোজিত হল অবসম্ভাবীভাবে তাদের বিষয়ভাবনায় মহাভারত স্থান করে নিল। মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনীর নতুন ভাষ্যে তিনি পরপর পাঁচটি কাব্যনাট্য রচনা করেছিলেন, যথা - 'তপস্বী তরঙ্গিনী' (১৯৬৭), 'কালসন্ধ্যা' (১৯৬৯), 'অনাম্নী অঙ্গনা' (১৯৭০), 'প্রথম পার্থ' (১৯৭০) এবং 'সংক্রান্তি' (১৯৭৩)। কাব্যগুণের সঙ্গে নাট্যগুণের অনবদ্য মিলন ঘটেছে এই কাব্যনাট্যগুলিতে। নাটকগুলি যেমন মঞ্চ-সফল তেমন এর শ্রবণ-সুখকর ভাষা একান্ত পাঠে বা শ্রবণে ততটাই রোমাঞ্চকর অনুভূতিদায়ক। তাঁর এই শ্রুতিসুখকর কাব্যনাট্যগুলি দিয়েই বর্তমানে বহুল প্রচলিত শ্রুতিনাট্য ধারাটির সূত্রপাত হয়। নতুন ধারায় রচিত এই মৌলিক কাব্যনাট্যগুলিতে নাট্যকার গদ্যের সজীব ও শাণিত ভাষা, নাটকীয় উপাদান ও অসামান্য কাব্যময়তার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন সুদক্ষভাবে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে পৌরাণিক আবহে আধুনিক সমস্যাকে, আধুনিক ভাবনাকে উপস্থাপিত করতে মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্র বাদে সার্থকতা পেয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। পুরাণের কাহিনীর মধ্যে যে সমকালীন আভাস পাওয়া যেতে পারে তার প্রমাণ এই কাব্যনাটকগুলি। পৌরাণিক উপাখ্যানে সমকালবর্তী ভাবনাকে স্থাপন করে রচিত এই নাটকগুলিতে নাট্যকার শুধু পুরাণের আধুনিকীকরণ ঘটিয়েছেন তাই-ই নয়, তাঁর দক্ষতায় এখানে পুরাণ যেন নবজন্ম লাভ করেছে। 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'তে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির উপাখ্যান, 'কালসন্ধ্যা'তে মহাভারতের মৌষল পর্ব, 'অনাম্নী অঙ্গনা'তে বিদুরের দাসীমাতার কথা, 'প্রথম পার্থ'তে পরাক্রমী বীর কর্ণের কথা এবং মহাভারতের যুদ্ধের শেষ দিন স্থান পেয়েছে 'সংক্রান্তি' নাটকে। নাট্যকারের উদ্দেশ্য এই সমস্ত পৌরাণিক অনুষঙ্গে মানবতাকে, আধুনিক সময়কে খোঁজা। বুদ্ধদেব বসু তাঁর রচিত এই পৌরাণিক নাটকগুলিতে যেহেতু পুরাণের আবহে সমকালীন ভাবনা প্রকাশ করতে চেয়েছেন, সেই সময়ের ঘটনাগুলোকে আধুনিক দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন তার ফলস্বরূপ পৌরাণিক চরিত্রদের সামান্য রদবদল ঘটেছে। আধুনিক দৃষ্টিতে পুরাণের ঘটনা ও চরিত্রকে দেখার ফলে, বলা যায় তাদেরকে দেবত্বের ঘেরাটোপ মুক্ত করার ফলে তাদের দোষ-গুণ সমন্বিত মানব রূপ পাঠক ও দর্শকের চোখে ধরা পড়েছে। তাঁর কলমে পৌরাণিক চরিত্ররা দেবত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষ রূপে প্রতিভাত হয়েছে। পুরাণের পাতার ঘটনা ও চরিত্রের অলৌকিকতার রহস্যমুক্তি ঘটেছে আধুনিক মনের উপযোগী যুক্তির উপস্থাপনে।

> "এই কাব্যনাটকগুলোতে মহাভারতের স্বর যেমন ধ্বনিত হয়েছে তেমনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে আধুনিক মানুষের যন্ত্রণাদীর্ণ বোধ।"[১]

রামায়ণ ও মহাভারতের ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কাহিনি আমরা কম-বেশি সবাই জানি। নাট্যকার সেই ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানের এক মর্মস্পর্শী নতুন রূপ দিলেন তপস্বী তরঙ্গিনী নাটকে। চার অঙ্কে সম্পূর্ণ এই পূর্ণাঙ্গ নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৭

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 65
Website: https://tirj.org.in, Page No. 586 - 595
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সালে। পুরাণ-কেন্দ্রিক পাঁচটি কাব্যনাট্যের মধ্যে এই নাটকটি প্রথম রচনা। শুধু রচনাকাল হিসেবে প্রথম তাই নয় রচনাগুণেও এই নাটকটি শ্রেষ্ঠত্বের স্থান অধিকার করেছে। এই নাটকটির রচনা প্রসঙ্গে নাট্যকার নিজেই বলেছেন –

> “সেটা আমি লিখেছিলাম আটান্ন বছর বয়সে, কিন্তু প্রথম যখন ভেবেছিলাম তখন আমি সবেমাত্র উত্তর তিরিশ।”[২]

নাটকটির রচনাকালের আরও তিরিশ বছর পূর্বে নাট্যকারের মনে এই নাটকটির ভাবনা জন্মেছিল। তিরিশ বছর ধরে জীবনের নানান অভিজ্ঞতা সেই ভাবনার সঙ্গে জুড়েছে। প্রসূত হওয়ার অপেক্ষায় থাকা নাটকটির ভাবনার সঙ্গে তাঁর জীবনবোধ মিশ্রিত হয়ে ১৯৬৬ সালে এক অনবদ্য সৃষ্টি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। পৌরাণিক আবহে আধুনিক ব্যক্তি মানুষের নিঃসঙ্গ জাগরণকে নাট্যকার এই নাটকে জানতে চেয়েছিলেন।

নাটকটিকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় কিছু কিছু টুকরো টুকরো সংলাপ ছাড়া পুরো নাটকটাই গদ্যে রচিত। এমনকি অন্যান্য নাটকগুলির মত এই নাটকটি প্রকাশের সময় তার মলাটে ‘কাব্যনাট্য’ বিশেষণটি ছাপা হয়নি, তার বদলে সেখানে লেখা হয়েছে ‘চার অঙ্কের নাটক’, তা সত্ত্বেও এটিকে কাব্যনাট্য হিসেবে ধরা হয়। গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিলে মূল নাটকটি কবিতারই বিষয়। তার ভাব, ভাষা, ভঙ্গী সবই কাব্যনাট্যের অনুকূল। নাটকটির গদ্যে রচিত স্থানেও কবিতার সুরমূর্ছনার অভাব ঘটে না। সর্বোপরি নাট্যকার নিজেই ছিলেন নাটকটিকে কাব্যনাট্য বলার পক্ষে। তিনি নিজে এই নাটকটিকে ‘কাব্যজাতীয় রচনা বলে ধরে’ নিতে চেয়েছেন। ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ নাটকটি রচনার পিছনে এলিয়টের ‘Murder in the Cathedral’ রূপকল্পের আভাস জুগিয়েছিল। এলিয়টের অনুসরণেই বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাটকে কোরাস ব্যবহার করেন। এলিয়টের মতোই পটভূমি ও সংলাপকে আকুতিময় প্রবলতায় নিয়ে গিয়ে, প্রতীক, শব্দস্পন্দ চরিত্রানুগ ভাষার সংলাপ রচনা করে তিনি নাটকীয়তা তৈরির চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর শৈলী নির্বাচনে ধ্রুপদী সাহিত্যের অম্বিষ্ট অনুশীলনও সাহায্য করেছিল।

ঋষ্যশৃঙ্গর কাহিনী আমরা রামায়ণের বালকাণ্ডে পাই। রামায়ণের বালকাণ্ডে ‘অঙ্গরাজের ঋষ্যশৃঙ্গ আনয়ন বৃত্তান্ত’ আছে। আবার মহাভারতেও আমরা আরেকটু বিস্তৃতভাবে এই কাহিনীর অবতারণা দেখতে পাই। নাট্যকারের কথা অনুযায়ী তিনি ‘সব বিস্তার ও অনুপুঙ্খ সমেত ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান’ পড়েছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহর মহাভারত থেকে। নাট্যকার কাহিনী নিয়েছেন পুরাণ থেকে, পুরাণের কাহিনীকে নাট্যকার নিজের মনোমত করে নতুনভাবে সাজিয়েছেন, সেই কাহিনীতে সঞ্চার করেছেন ‘আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ব বেদনা’। এই নতুনত্ব আদান করতে গিয়ে পৌরাণিক গল্পকে কিছুটা পরিবর্তন করে নিতে হয়েছে। মূল কাহিনীতে ছিল দীর্ঘ তপস্যায় শ্রান্ত বিভাণ্ডক হ্রদে স্নানরত অবস্থায় ঊর্বশীকে জলে রেতঃপাত করেন, জল সহ সেই রেতঃ পান করে এক হরিণী গর্ভিণী হয় এবং ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রসব করে। নাট্যকার ওখানে অলৌকিক কোনো ঘটনাকে প্রাধান্য দিতে চাননি যার ফলে শ্রান্ত মুনির কামোন্মাদনা জাগাতে উর্বশীর ভূমিকা থাকলেও গর্ভধারণের জন্য হরিণীর বদলে আনা হয়েছে কিরাত রমণীকে। কামোন্মত্ত মুনি এক কিরাতরমণীর সঙ্গলাভ করে পুত্ররূপে ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রাপ্ত করেন এবং সেই স্থান ও উক্ত রমণীকে পরিত্যাগ করে পুত্রকে নিয়ে পুনরায় সাধনার পথে ব্রতী হন। পৌরাণিক কাহিনীতে আমরা হরিণীর গর্ভজাত হওয়ায় ঋষ্যশৃঙ্গ-র মাথায় একটি শিং দেখতে পাই। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাটকের চরিত্রদের দোষে-গুণে সমৃদ্ধ মানবরূপে অঙ্কণ করেছেন। ফলে তিনি ‘মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন’ নায়কটির মাথায় শিং লাগাননি। মূল পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের প্রতি অসৎ ব্যবহার করেছিলেন যার ফলে ব্রাহ্মণরা তাঁকে ত্যাগ করেন ও ক্রোধপরবশ হয়ে ইন্দ্রদেব তাঁর রাজ্যে বৃষ্টি বন্ধ করেন। অনাবৃষ্টির ফলে সমগ্র রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। নাট্যকার নাটকে অনাবৃষ্টির কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন লোমপাদের বীর্যহীনতাকে। এখানে নাট্যকার ভূমি ও নারীগর্ভের উর্বরতাকে একই প্রকৃতি চক্রের অন্তর্গত করতে চেয়ে এই পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। ঋষ্যশৃঙ্গর মূল কাহিনীতে তাঁকে প্রলুব্ধ করেছিল একদল বারাঙ্গনা। কোনো একক মেয়ের কথা সেখানে নেই। নাট্যকার এখানে আজন্ম নারীসঙ্গহীন এক ঋষিকে বারাঙ্গনাদের দিয়ে অপহরণ করে আনার কোনো সরল কাহিনী রচনা

করেননি, এখানে তিনি সেই দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে অঙ্কন করেছেন এক পৃথক রমণীকে। দুজন দুজনের প্রতি কামনার হাত ধরে পৌঁছে গেছে সাধনার উচ্চসীমায়।

ঋষ্যশৃঙ্গর এই কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'পতিতা' নামে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। কবি সেখানে বারাঙ্গনা দলের মধ্যে একজন রমণীকে পৃথক করে, প্রধান করে চিত্রিত করেছেন। ঋষ্যশৃঙ্গর অপাপবিদ্ধ সরলতা তার মনকে গ্লানিতে ভরিয়ে দিয়েছে। তার কাজের জন্য তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দান করা হয়েছিল তা সে ফিরিয়ে দিয়েছে রাজমন্ত্রীকে। বুদ্ধদেব 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'তে এই একই ধরণের কাহিনী ব্যবহার করেছেন। সেই হিসেবে বলা চলে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতার কাছে ঋণী। কিন্তু নাট্যকারের ভাবজগৎ তার থেকে আলাদা। 'পতিতা' কবিতায় ঋষ্যশৃঙ্গর আদিম সারল্য বারাঙ্গনাকে মুগ্ধ করেছিল, ঋষ্যশৃঙ্গর কাছে সে আত্মসমর্পণ করেছিল। কবিতায় উনিশ শতকীয় রোমান্টিকতার আস্বাদ পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব বসু শুধু সেখানেই থেমে থাকেননি।

ঋষ্যশৃঙ্গ তপোবনের আশ্রমে পিতা বিভাণ্ডকের সঙ্গে একান্তে জীবন কাটাচ্ছিলেন। পিতা এবং বন্য পশু-পাখি ব্যাতীত কোনো প্রাণী সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি ছিলেন সমাজ, জীবন ও প্রকৃতির চক্র থেকে অনেক দূরে। আদিম মানুষের মত প্রকৃতিতে নিমজ্জিত, প্রকৃতিকে আত্মস্থ করে বেঁচে থাকা মানুষ। তাঁর ছোট্ট গন্ডীতে অবস্থিত সবকিছুই তাঁর আত্মীয়। কিন্তু সভ্যতার পক্ষে এই অজ্ঞতা ক্ষতিকর। তাই তাঁকে নিষ্পাপ স্বর্গোদ্যানে ছুঁতে হল জ্ঞান বৃক্ষের ফল, কৌতূহল আর লোভের ফলে তাকে আসতে হল নগরে। ঋষ্যশৃঙ্গকে শহরে আনা হল তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নয়, রাজ্যের মানুষের প্রয়োজনে। যাতে অনাবৃষ্টি বন্ধ হয়ে বর্ষণের শুরু হয়, সভ্যতার চাকা সচল থাকে। আর সেই অপহরণের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল তরঙ্গিণী ও তার সখীদের। নানারকম ছলাকলায় ঋষ্যশৃঙ্গর মনে কামনার উদ্রেক ঘটিয়ে, তাঁকে প্রলুব্ধ করে তরঙ্গিণী তাকে নিয়ে আসে নগরে। অনাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া অঙ্গরাজ্যে ঋষ্যশৃঙ্গকে এনে, তাঁর ব্রহ্মচর্য ব্রতপালন বন্ধ করে, তাঁর সঙ্গে রাজকুমারী শান্তার বিবাহ দিলে অঙ্গরাজ্য আবার আগের মতো সুজলা সুফলা হবে বলে দৈববাণী হয়। ঋষ্যশৃঙ্গ রাজ্যে আসলে তাঁর সঙ্গে রাজকুমারী শান্তার বিবাহ দেওয়া হয়, তাঁদের এক পুত্রসন্তানও হয়। তাঁদের বিবাহের পর লোমপাদের রাজ্য পুনরায় সুফলা হয়ে ওঠে। রাজকুমারী শান্তা ও মন্ত্রীপুত্র অংশুমান দুজন দুজনকে ভালোবেসে বরণ করেছিলেন। কিন্তু এ বিবাহের ফলে তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়। অন্যদিকে ঋষ্যশৃঙ্গ সংসার, রাজ্য সবকিছুর মাঝেও খুঁজে বেড়ান তাঁর জীবনে নারী ও কামনা সম্পর্কিত ধারণা প্রদানকারী সেই নারীকে। আর তরঙ্গিণীও গভীর মর্মাহত হয়ে তার কাজ ছেড়ে নিজেকে বন্দী করে রাখে গৃহমধ্যে। তপস্বীর সরলতায়, তাঁর মুগ্ধতায় বিহ্বল হয়ে তরঙ্গিণী তাকেই মন সঁপেছে। নাটকের অন্তিমে দেখা যায় ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তাকে কুমারীত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন, রাজ্য ও শান্তাকে তুলে দিয়েছেন অংশুমানের হাতে, তরঙ্গিণীকে সাধনার পথে ব্রতী হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন এবং নিজে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন এক বৃহতের উদ্দেশ্যে। সাধারণত যাকে 'কাম' বলে নিন্দে করা হয় তারই প্রভাবে দুজন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। পুরাণে তরঙ্গিনীর কোনো নাম ছিল, তার পরিচয় ছিল জনৈক বেশ্যাকন্যা। নাট্যকার এখানে তাঁকে স্বতন্ত্রতা দান করেছেন। নাট্যকার তার নাম দিলেন, অবয়ব দিলেন, তার মধ্যে জন্ম দিলেন প্রেমিক সত্তাকে। সমস্ত বৈষয়িক বাসনাকে ত্যাগ করে ঋষ্যশৃঙ্গের নির্দিষ্ট সাধন পথে চলতে পারার মত উচ্চস্তরে নিয়ে গেলেন বারাঙ্গনার মনকে। পৌরাণিক শুষ্ক কঠোর তপস্বীরূপের খোলস থেকে ঋষ্যশৃঙ্গের কোমল মানব হৃদয়কে নাট্যকার এই নাটকে বের করে এনেছেন। সংযোজন করেছেন মানসিক টানা-পোড়েন। মহাভারতের কাহিনী শান্তা ও ঋষ্যশৃঙ্গের পুত্র জন্মের পর পুনরায় ঋষ্যশৃঙ্গের সাধনার উদ্দেশ্যে বনে গমনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু নাট্যকার এখানে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনীর মানসিক দ্বন্দ্বকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে নাটকটিকে আধুনিক মনের উপযোগী করে তুলেছেন।

নাট্যকারের পরবর্তী কাব্যনাটক 'কালসন্ধ্যা' মহাভারতের মৌষল পর্বের অন্তর্গত যদুবংশ ধ্বংসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ভূমিকায় নাট্যকার কুরুক্ষেত্রের প্রেক্ষাপট স্মরণ করেছেন –

> "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হবার পরে গান্ধারী কৃষ্ণকে বলেছিলেন - 'তুমি যেমন কুরুপাণ্ডবের বিনাশ ঘটালে, তেমনি তোমার জ্ঞাতিগোষ্ঠীরও ধ্বংসের কারণ হবে তুমি। আজ থেকে ছত্রিশ বৎসর পরে পুত্রহীন,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 65
Website: https://tirj.org.in, Page No. 586 - 595
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> জ্ঞাতিহীন অবস্থায় তোমার অপমৃত্যু হবে-আমি তোমাকে এই অভিশাপ দিচ্ছি।' কৃষ্ণ হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'দেবী, আমি সবই জানি। যা অবশ্যম্ভাবী, আপনার অভিশাপে তাই-ই উক্ত হ'ল'।"[৩]

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষে শত পুত্রের বিয়োগ ব্যথায় ব্যথিত গান্ধারীর এই অভিশাপ তথা ভবিষ্যৎবাণী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ছত্রিশ বছর পর পূর্ণ হয়। 'কালসন্ধ্যা' নাটকে যাদববংশ ও দ্বারকাপুরীর শেষ সময় স্থান পেয়েছে। বলা-বাহুল্য নাটকের কাহিনীর ইঙ্গিত যদুবংশ ও দ্বারকার ধ্বংস পেরিয়ে বহু দূরে প্রসারিত। নাটকটির চির পরিচিত এই কাহিনীর অন্তরালে নিহিত আছে মানব সভ্যতার আদি সত্য। এর আবেদন চিরকালীন মানব-ইতিহাসের। ক্রান্তদর্শী কৃষ্ণ গান্ধারীর অভিশাপকে গ্রহণ করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন কালচক্রে আবর্তিত মানুষ কীর্তি স্থাপন করে, নির্দিষ্ট কালসীমার অন্তে মহাকালের সমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়। যদুবংশ-ধ্বংস, কৃষ্ণের জীবনলীলা সংবরণ, অর্জুনের অভাবনীয় পরাভব কাহিনীর মধ্যে দিয়ে মহাকালের এই বৈনাশিক রূপটি কাব্যনাট্যকার ইঙ্গিতময় করে তুলেছেন। নাট্যকার তাঁর আদি, চিরন্তন মিথ-আশ্রয়ী জীবনসত্যের উপলব্ধির জন্যই 'কালসন্ধ্যা' কাব্যনাটকে যদুবংশ ধ্বংসের নাটকীয় ঘটনার সঙ্গে অর্জুন-কাহিনীকে যুক্ত করেছেন। মহাকালের কালচক্রের একটি সন্ধিক্ষণের প্রেক্ষাপটে আধুনিক মানুষের দুর্জ্ঞেয় জীবনে নিয়তির সংকেতময়তা যুক্ত করে একে বিশ্বজনীন রূপ দিয়েছেন নাট্যকার।

নাটকটিতে দুটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে আমরা গ্রিক নাটকের 'Prologue' এর মত একটি পূর্বরঙ্গ দৃশ্য দেখতে পায়। এখানে দুই বৃদ্ধের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত ধ্বংসের রূপটি আভাসিত। এই দুই বৃদ্ধ যেন গ্রিক নাটকের কোরাস চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ। আর নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক তথা নাটকের শেষে দেখি গ্রীক নাটকের 'Epilogue'-এর মত উত্তরকথন দৃশ্য। যেখানে 'বয়সের অতীত' ব্যাসদেব অর্জুনকে জীবনের পাঠ শিখিয়েছেন এবং 'কালসন্ধ্যা'র স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষ স্বাধীন বা সর্বশক্তিমান নয়, সে কালচক্র এবং নিয়তির অধীন। শ্রীকৃষ্ণ ক্রান্তদর্শী ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ হয়েও যদুবংশকে রক্ষা করতে পারেননি। যাদবরা পরস্পরের সংহারে লিপ্ত হয়েছিল, ব্যধের তীরে শ্রীকৃষ্ণের দেহাবসান হয়েছিল, দ্বারকাপুরীও সমুদ্রের তলায় তলিয়ে গিয়েছিল। কালচক্রে-পিষ্ট অর্জুন তাঁর কুরুক্ষেত্র জয়ের পরাভব হারিয়ে সামান্য দস্যুদের হাত থেকে যাদব নারীদের রক্ষা করার জন্য গাণ্ডীব উত্তোলনে অক্ষম হয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসু এই বৃত্তান্তটির সামগ্রিক এবং মিথিক প্রকরণধর্মী বিন্যাস ঘটিয়ে সমকালীন সন্ধিযুগের ক্ষয় ও পতনের মর্মটিকে রচনায় প্রথিত করে দিয়েছেন। প্রবল কীর্তি, অলৌকিক শক্তিও কালের নির্ধারিত নিয়মের অধীন এই সত্যই এখানেই ফুটে উঠেছে।

মহাভারতের কাহিনীর কিছু কিছু অলৌকিকতা নাট্যকার এখানে পরিহার করেছেন। তার পরিবর্তে ফুটিয়ে তুলেছেন যুক্তিনির্ভর কার্য-কারণ সম্বন্ধ। নাটকের প্রথম অঙ্কে দুই যাদব নারী সত্যভামা ও সুভদ্রার কথোপকথনে যাদবদের প্রতি উৎকণ্ঠার পাশাপাশি খণ্ড খণ্ড দৃশ্যে নাট্যকার যাদবদের অমিতাচারের চিত্রও ফুটিয়ে তুলেছেন। তাদের ক্লেদাক্ত লালসা, উচ্ছৃঙ্খলতা, উন্মত্ত পাশবিকতা, রক্তাপ্লুত বীভৎসতা এসব দৃশ্যে কদর্য ও ভয়াবহ হয়ে ধরা দিয়েছে। তাদের কাছে জীবনের সার মন্ত্র হল 'মাধ্বী ও শিশ্ন'। ভোগ-বাসনা, কাম-লালসায় ডুবে তারা অতীত গৌরবকে অমর্যাদা করেছে। ফলে প্রতিবাদী প্রজার প্রতিশোধ বাসনা উচ্চস্বরে ধ্বনিত হয়েছে। এ যেন বিংশ শতাব্দীর হানাহানিপূর্ণ অস্থির সময়ের চিত্র। নাট্যকার এখানে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও ব্যক্তিক স্খলনকে একসূত্রে গেঁথে সার্বিক অবক্ষয়ের পূর্বাভাসকে দ্যোতিত করেছেন। এই অবক্ষয় থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় যে কৃষ্ণ তিনি সর্ব-দ্রষ্টা ও সর্ব-নিয়ন্তা হয়েও নির্বিকার, নিস্পৃহ। কারণ তিনি যেমন স্রষ্টা তেমন সৃষ্টি রক্ষার দায়িত্বও তাঁর। তাই মহান কর্তব্য সম্পাদনে প্রয়োজনীয় তাঁর সৃষ্টি যখন যাবতীয় বিনাশ কার্যে প্রবৃত্ত, তখন তাদের বিনাশ সাধন করে কৃষ্ণ সৃষ্টির মহা-নিয়মের ভারসাম্য রক্ষা করলেন। তাঁর মতে -

> "জেনো, এই ধ্বংস-এও ভালো। এরই সংযোজনে
> ফিরে এল বৃত্তবিন্দু, পূর্ণ হ'লো কালের ঘূর্ণন।"

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে আমরা অর্জুনকে পাই। দ্বারকার নারী, বৃদ্ধ আর শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে দ্বারকায় আসা অর্জুনের চেহারায় আমরা বয়সের ছাপ দেখতে পাই। শুধু অর্জুন নয় এখানে কৃষ্ণও বয়স্ক এবং কিঞ্চিৎ স্থূল অবয়বের। উভয়েরই চালচলনে বিরোচিত দর্প প্রকাশিত হলেও দৈহিক শক্তির অবক্ষয় হয়েছে তা বুঝতে

কষ্ট হয়না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মহাপরাক্রমশালী যুবক অর্জুন বয়স্ক হয়েছেন। অর্জুনের মুখে পৌঢ়ত্বের চিহ্ন, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। নাট্যকার এই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ও দেব-আশীর্বাদধন্য দুই পুরুষের বাহ্যিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন অসামান্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কালচক্রের অন্তর্গত, তাঁদের বিনাশ বা শক্তি-ক্ষয় অবসম্ভাবী। তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থানের পর দস্যুদের হাত থেকে অর্জুন যাদব নারীদের রক্ষা করতে পারলেন না। কৃষ্ণের দীপ্তিতে দীপ্তমান অর্জুন স্তিমিত বল হয়ে এসেছেন কৃষ্ণের প্রস্থানে। অর্থাৎ কালসন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। নাট্যকার এখানে অর্জুন চরিত্রে দুর্জ্ঞেয় নিয়তিবাদের সঙ্গে আধুনিক আমিত্ববোধ ও মানসিক-দ্বন্দ্বকে সুদক্ষভাবে জুড়ে দিয়েছেন। মহাভারতের অর্জুন দস্যুদের সঙ্গে ব্যর্থ সংগ্রামে তাঁর অক্ষয়তূণের দ্রুত ক্ষয় দেখে 'দৈব দুর্বিবাক' ভেবে প্রতিনিবৃত্ত হন, কিন্তু 'কালসন্ধ্যা'র নিয়তিপীড়িত অর্জুন আমিত্ববোধে আক্রান্ত হয়ে উপলব্ধি করেন -

"অন্তহীন মহাশূন্যে
আমি যেন মজ্জমান-শরীরসর্বস্ব জড়!
শ্রুতি নেই শ্রবণে, দ্যাখে না চক্ষু, ত্বকে আর নেই স্পর্শবোধ,
ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে স্ফুলিঙ্গ জ্বলে না-
নির্বাপিত নষ্টবল, নিঃশেষ অর্জুন,"

অতীত গৌরব হারিয়ে অর্জুনের হাহাকার বেঁচে থেকে মৃত্যুর তুল্য অভিজ্ঞতালাভের যন্ত্রণায় রক্তাক্ত। বুদ্ধদেব খুব সহজেই জীবন্মৃতের এই যন্ত্রণা ও শূন্যতাবোধের চরম অসহায়তাকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। এই অসহায়ত্ব, এই আত্ম-বোধ ও দ্বন্দ্ব অর্জুনকে পুরাণের গণ্ডী পার করে আধুনিক মানুষ করে তুলেছে।

যাদব-বংশ ও দ্বারকানগরীর ধ্বংস, অর্জুনের পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে কালের বিবর্তনের রূপ ব্যঞ্জিত। যুগসন্ধিক্ষণে যখন কালসন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে তখন অবক্ষয়িত সমাজে চিরন্তন মূল্যবোধগুলি খসে পড়ে। তখন নতুন সূর্যের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকে না। কালসন্ধ্যা অমোঘ, অনিবার্য ও জাগতিক নিয়মের অঙ্গ। একটা কালের সমাপ্তিতেই থাকে নতুন কালের সূচনা।

পরের কাব্যনাট্যটির বিষয়ও মহাভারত। মহাভারতের অন্যতম চরিত্র বিদুরের জন্মকথাকে আশ্রয় করে বুদ্ধদেব বসু রচনা করেছেন 'অনাম্নী অঙ্গনা' (১৯৭০) নামক কাব্যনাট্যটি। নাটকটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর নিঃসন্তান দুই রানীর গর্ভে সন্তান প্রদানের জন্য নিয়োগ করা হয় মহর্ষি বেদব্যাসকে। সেই সময়ই বেদব্যাসের নিয়োগে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর সঙ্গে এক দাসীর গর্ভে জন্ম হয় বিদুরের। অম্বিকা ও অম্বালিকার পাশাপাশি মহর্ষি বেদব্যাসের সন্তান প্রাপ্ত করেছিল অন্তঃপুরের অনাম্নী এক দাসী। সেই অখ্যাত অনাম্নী দাসীকেই নাট্যকার 'অনাম্নী অঙ্গনা'তে প্রধান ভূমিকায় এনেছেন। নাটকটির কোনো দৃশ্য ভাগ নেই, তবে কাহিনীর উপর নজর রাখলে নাটকটিকে চারটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশে অঙ্গনা ও তার দুই সখীর কথোপকথন আছে, সেখান থেকে জানা যায় অঙ্গনার গোপন প্রণয়ের কথা, সংসার বাসনার কথা। দ্বিতীয় অংশে রানী অম্বিকার সঙ্গে রাজমাতা সত্যবতীর কথোপকথন, এই অংশে আমরা জানতে পারি দুই রানীর গর্ভজাত সন্তান ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু শারীরিকভাবে অসম্পূর্ণ তাই সিংহাসনের প্রয়োজনে অম্বিকাকে আরেকবার ব্যাসদেবের ঔরসে গর্ভবতী হওয়ার আদেশ নিয়ে আসেন সত্যবতী। পরের দুটি অংশে অম্বিকা ও অঙ্গনার কথোপকথন আছে। একটিতে অঙ্গনাকে বেদব্যাসের অঙ্কশায়িনী হওয়ার জন্য অম্বিকার প্রস্তাব, প্রলুব্ধ করা ও অবশেষে অঙ্গনার সম্মতি প্রদান এবং অন্যটিতে ব্যাসদেবের সান্নিধ্যে পরিবর্তিত অঙ্গনার অনুভূতির প্রকাশ।

মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই নাটকে নাট্যকার সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন অনাম্নী অঙ্গনাকে। মহাভারতে বিদুরের দাসী মাতা উপেক্ষিতা। মহৎ কর্মে রত মহাভারতকার তার নামটা উল্লেখ করার প্রয়োজনও বোধ করেননি। বুদ্ধদেবও এই দাসীমাতার মহত্তম-ব্যপ্তিকে সীমিত গণ্ডীতে বাঁধতে চাননি তাই তিনিও তাঁর প্রধানা এই নায়িকা চরিত্রের নামকরণ করেননি। নাটকে সে অনাম্নী অঙ্গনা। তবে নারীত্ব বিকাশের অপূর্ব সৌন্দর্য-লাবণ্যে, নিজের অনুভূতির সার্থক প্রকাশে মহাভারতের উপেক্ষিতা নাটকে সম্মানিতা। অঙ্গনার বিপরীতে নাট্যকার স্থাপন করেছেন অম্বিকাকে। রানী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 65
Website: https://tirj.org.in, Page No. 586 - 595
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হয়েও তাঁর মন কতটা আত্মচিন্তায় বিভোর, নিজের প্রয়োজনে কিভাবে তিনি অন্যের জীবনকে বাজি রাখতে পারেন নাটকে তা দেখা যায়। রানীর যে মহান হৃদয় প্রজাদের রক্ষা করে, সহায় হয় 'অনাম্নী অঙ্গনা'য় রানী অম্বিকার মধ্যে আমরা তা পাই না। সমাজের উচ্চস্তরের মানুষেরা কিভাবে নিম্নস্তরের মানুষদের সর্বান্তকরণে শোষণ করে তার চিত্র নাট্যকার এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন। পৌরাণিক আবহাওয়া, পৌরাণিক চরিত্র, পৌরাণিক ঘটনা হয়েও এ নাটক আধুনিক সমাজের চিত্রকে পরিস্ফুট করেছে।

নাটকের প্রথম অংশে জানা যায় অঙ্গনা মন দিয়েছে এক তন্তুবায় যুবককে। তার সঙ্গে সংসারের স্বপ্ন দেখেছে। সে যুবকও রানী অম্বিকার থেকে অঙ্গনাকে মুক্ত করার জন্য দাসীপণ জোগাড় করেছে। কিন্তু রানী অম্বিকা কোন মতেই তার দাসী অঙ্গনাকে মুক্তি দিতে চান-না। প্রকারান্তরে তিনি প্রস্তাব করেন পরিণীতা হয়ে রাজবাড়িতে ফিরে এলে স্বামীকেও রাজভৃত্য করে নেবেন। অঙ্গনা নিজে যে পরাধীনতার শিকল পরেছে স্বামীকে সে বাঁধনে বাঁধতে দিতে চায় না। আর নিজেও স্বপ্ন দেখে একটা নিজের ঘরের, নিজের কাজের। কিন্তু সে জানে তার এ স্বপ্ন পূরণ হবে না। কারণ সে 'উত্তম দাসী, তাই অর্ধেকমাত্র নারী'। নারীত্বের পূর্ণতার স্বাদ দাসীদের ভাগ্যে পাওয়া হয়ে ওঠে না। তার মত আরও অনেক অবলা নারী আছে এই রাজপুরীতে, যারা এমনই দুর্ভাগ্যপীড়িতা। তাদের কোন অধিকারই নেই নিজের জীবন নিজের মত করে কাটানোর। তাদের প্রভুদের প্রয়োজনে তারা নিজের জীবনকে আহুতি দিতে বাধ্য। এবং প্রভুরাও তাদেরকে নিজেদের সম্পত্তি মনে করেন। তাই যখন মাতা সত্যবতী অম্বিকাকে ব্যাসদেবের অঙ্কশায়িনী হওয়ার আদেশ নিয়ে আসেন অম্বিকা তখন যেন-তেন-প্রকারেণ সেই কক্ষে অঙ্গনাকে পাঠান। অঙ্গনার প্রেম ও সংসারের আকাঙ্ক্ষা অম্বিকা জানতেন। তাই নিজে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য অঙ্গনার সেই দুর্বলতারই সাহায্য নিয়েছেন। তাকে তার কাঙ্খিত মুক্তি, প্রণয়, সংসারের লোভে প্রলুব্ধ করে নিজের কার্যসিদ্ধি করতে চেয়েছেন। কুমারী, 'প্রিয়দর্শিনী', 'সংহত যৌবনা' দাসী অঙ্গনাকে পাঠাতে চেয়েছেন ব্যাসদেবের সান্নিধ্যে। কিন্তু অঙ্গনা সাধারণ মানুষ। সে জানে যে নিয়ম-নীতির অবমাননা রাজা-রাজড়া, মুনি-ঋষিদের চলে তা তাদের মত 'ব্রহ্মার অধমাঙ্গ' থেকে জন্ম নেওয়া জাতি-কুলের চলে না। তাই সে রানীর আদেশ মানতে গিয়ে নিজের সংস্কার-চ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা দেখে ভীত হয়েছে। তার কৌমার্য ও সতীত্বের সংস্কার, তন্তুবায় যুবকের প্রথম প্রণয় প্রকাশের সুখানুভূতি ও প্রভুর আদেশ পালনের দ্বন্দ্বে সে দ্বিধাগ্রস্ত। বুদ্ধদেব বসু অপূর্ব কবিত্ব ও অসাধারণ নাটকীয়তায় অঙ্গনার অন্তর্দ্বন্দ্বকে এই অংশে তুলে ধরেছেন। ছলনাময়ী অম্বিকা তার মানসিক দোলাচলতার সুযোগ নিয়ে এই কাজকে 'দেবতার নির্দেশ', 'সৌভাগ্যের আহ্বান!' বলেছেন। মোহাবিষ্ট অঙ্গনাকে নিয়ে সুচতুর অম্বিকা সতর্ক থেকেছেন, যাতে শেষ মুহূর্তের ভীরুতা তার মন বদলে দিতে না পারে। নিজের হাতে দাসীকে রানী সাজিয়ে নিজের কর্তব্য পালনে পাঠিয়েছেন অম্বিকা।

অম্বিকার দোলাচলতা ঋষি মিলনের পর সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। ঋষির মহনীয়তা উপলব্ধি করে নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করে ঋদ্ধ হয়েছে অঙ্গনা, আত্মমগ্নভাবে ঋষির গুণগান করেছে। অম্বিকার ভয়ংকরদর্শন ভীষণ পুরুষ অঙ্গনার সমর্পিত হৃদয়ে গভীর অরণ্যের মতো মনে হয়েছে। সেই প্রথম ও শেষ মিলন অঙ্গনার হৃদয়ে চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। আসন্ন পুত্রপ্রাপ্তির আশায় অঙ্গনা তার নিজস্ব আকাঙ্খা বিসর্জন দিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে। অঙ্গনা গুণযুক্ত পুত্র পাওয়ার সম্ভাবনায়, তাকে যোগ্য করে তোলার আকাঙ্খায়, সর্বপরি একরাত্রির মিলন তার হৃদয়কে যে আধ্যাত্মিকতায় উন্নীত করেছিল তার জন্য রাজবাড়ি ছেড়ে যেতে চায়নি।

ভরত বংশের কাহিনীর এই বিশেষ অংশকে গ্রহণ করলেও নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু এখানে সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে গেছেন। অম্বিকা সমাজের উঁচুস্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন আর অঙ্গনা প্রতিভূ হয়েছে সমাজের নিচু স্তরের মানুষের। পৌরাণিক সময়ই হোক আর অত্যাধুনিক যুগই হোক উঁচুস্তরের মানুষেরা সর্বদা নিম্নস্তরের মানুষদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে। অন্তঃপুরের দাস, দাসীরা নিতান্ত জড়বস্তুর ন্যায় ব্যবহৃত হত পৌরাণিক যুগে। তাদের নিজস্ব জীবন, আশা, আকাঙ্খার মূল্য দেওয়া হত না। কোনো দাসী স্বাধীন সংসার করতে চায়লে তার পাণিপ্রার্থীকে রানীর হাতে তুলে দিতে হত 'দাসীপণ'। আর সে পণ দিতে না পারলে ত্যাগ করতে হত তাকে পাওয়ার স্বপ্ন। নাটকে আমরা দেখেছি দাসী অঙ্গনার সঙ্গে অম্বিকার এই একই ব্যবহার। অম্বিকা চতুরতার সঙ্গে অঙ্গনাকে রাজি করিয়েছে তাঁর বিকল্প হওয়ার জন্য। অঙ্গনার সংস্কার, আকাঙ্ক্ষা, প্রণয় সব জানার পরও তাকে ছলনার আশ্রয় নিয়ে মোহাবিষ্ট করেছে। নিজে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 65
Website: https://tirj.org.in, Page No. 586 - 595
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য দাসীর জীবনের আকাঙ্খাকে বলি দিয়েছে। নাট্যকার অম্বিকার মাধ্যমে সমাজের উঁচু স্তরের স্বার্থান্ধ মানুষদের ছবি এঁকেছেন, আর এখানেই এই নাটক পৌরাণিকতার গণ্ডী পেরিয়ে আধুনিক জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে।

'কালসন্ধ্যা' নাটকে নাট্যকার মহাভারতের যে যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের চিত্র দেখিয়েছেন, 'প্রথম পার্থ' (১৯৬৯) নাটকে আমরা সেই যুদ্ধের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ধ্বনি শুনতে পাই। 'প্রথম পার্থ' নাটকটি ধারাবাহিকভাবে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'অনাম্নী অঙ্গনা'র মতো এই নাটকেও কোনো দৃশ্য বিভাগ নেই। এখানেও আমরা বিষয়বস্তু অনুসারে নাটকটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। নাটকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সম্ভাবনায় কৌরব পক্ষে যোগদানে ইচ্ছুক কর্ণের কাছে পর্যায়ক্রমে কুন্তী, দ্রৌপদী ও কৃষ্ণ এসেছেন। তাঁদের সবার চাওয়া কর্ণ যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগ না দেন। মূল মহাভারত থেকে নাট্যকার এখানে অনেকটা সরে এসেছেন। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে যুদ্ধের আগে কৃষ্ণ কুন্তীর কাছে যান। কৃষ্ণর মাধ্যমে কুন্তী তাঁর পঞ্চপুত্রকে যুদ্ধে প্রণোদিত করার জন্য কিছু উপদেশ দিয়ে পাঠান। কৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুর থেকে বের হন তিনি রথে সঙ্গী হিসেবে কর্ণকে নিয়ে যান। সেই যাত্রাপথেই তিনি কর্ণকে তাঁর আসল পরিচয় প্রদান করেন, এবং এও জানান যে কুন্তীর বাসনা কর্ণ যুদ্ধে যোগ না দেন। কৃষ্ণের কথা শুনে কর্ণ কৃষ্ণকে জানান কুন্তী অমঙ্গল আশঙ্কায় শিশু অবস্থায় তাঁকে ত্যাগ করেছেন, রাধা ও অধিরথ তাঁকে পুত্র স্নেহে পালন করেছেন। দুর্যোধনের আশ্রয়ে তিনি রাজ্যভোগ করছেন এবং তাঁর ভরসায় দুর্যোধন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হচ্ছেন, সেক্ষেত্রে তিনি দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে পারবেন না, তা ধর্মবিরুদ্ধ। তিনি তাঁর কর্তব্যবোধ বা পূর্ব পরিচয় ত্যাগ করতে পারবেন না। ফলে কুন্তীর কথা রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর জ্ঞাতিবধের সম্ভাবনায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কুন্তী কর্ণের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর শঙ্কা প্রকাশ করে কর্ণকে নিরস্ত হতে বলেন। কর্ণের জন্মদাতা পিতাও তাকে কুন্তীর আকাঙ্খা পূর্ণ করতে অনুরোধ করেছেন। কর্ণ একথা মেনে নেননি, কুন্তীকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছেন। মহাভারতে কৃষ্ণ ও কুন্তীর সঙ্গে কর্ণের সাক্ষাতের এবং যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকার প্রস্তাব দেওয়ার প্রসঙ্গ থাকলেও দৌপদীর সঙ্গে কর্ণের সাক্ষাতের কথা মহাভারতে নেই। দ্রোপদী ও কর্ণের সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ নাট্যকারের নিজস্ব সংযোজন।

যুদ্ধের প্রক্কালে প্রথম ও পরিত্যক্ত পুত্র কর্ণের কাছে উদ্বেলিত হৃদয়ে কুন্তী এসেছেন তাঁর মাতৃত্বের দাবী নিয়ে। মহাভারতের এই অংশকে রচনার আধার হিসেবে রবীন্দ্রনাথও গ্রহণ করেছিলেন তাঁর 'কর্ণকুন্তী সংবাদ'-এ। 'কর্ণ কুন্তী সংবাদ'-এ অবশ্য কর্ণ ও কুন্তীর কথোপকথনে প্রাধান্য পেয়েছে মাতৃস্নেহ ও ধর্মবোধের টানাপোড়েন। অন্যদিকে বুদ্ধদেবের এই 'প্রথম পার্থ' নাটকে কুন্তী, দ্রোপদী বা কৃষ্ণের আগমন শুধু ব্যক্তিগত স্নেহ, ভালোবাসা বা প্রীতির মধ্যে আটকে থাকেনি, তাঁদের উদ্দেশ্য আরো গূঢ় রূপে দেখা দিয়েছে। তাঁদের বক্তব্য কর্ণের কাছে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ না পেলেও তাঁরা দুই বৃদ্ধের কাছে তা প্রকাশ করেছেন। এই নাটকে নাট্যকার কর্ণকে স্থিতধী, প্রাজ্ঞ, প্রতিভাবান আধুনিক মানুষরূপে অঙ্কণ করেছেন।

মহাভারতের কর্ণ যোগ্যতার শীর্ষ স্পর্শ করেও নিজেকে প্রমাণিত করতে পারেননি। সমাজের ক্ষমতার আসনে বসে থাকা মহাপুরুষরা বারবার তাঁর যোগ্যতার উপর স্থান দিয়েছেন বংশ পরিচয়কে। তাঁর ক্ষমতা খাটো করা হয়েছে তাঁর জন্ম-পরিচয় দিয়ে। একজন যোদ্ধা হওয়ার সব গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও তিনি বারবার অপমানিত হয়েছেন, অবহেলিত হয়েছেন। জন্ম সূত্রে তিনি কুন্তীর প্রথম সন্তান, সেই অর্থে যে সম্মান পাণ্ডবরা পেয়েছেন তা তাঁরও প্রাপ্য ছিল। কিন্তু কর্ণের জন্মের পরই লোকলজ্জায় কুন্তী তাঁর কুমারী অবস্থার এই পুত্রকে বিসর্জন দেন। পরবর্তীতে কর্ণের বেড়ে ওঠা সুত অধিরথের গৃহে। তাঁর পরিচয় সুতপুত্র। ফলে তিনি অস্ত্রশিক্ষা বা চর্চার অধিকারী নন। নিজের অদম্য আকাঙ্খায় যদিওবা অস্ত্রবিদ্যা শিখলেন তবুও পদে পদে অপমান তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি। ঘটনাক্রমে দুর্যোধনের সহায়তা-লাভ এবং বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিজেরই ভাইদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ও অর্জুনের অস্ত্রে প্রাণত্যাগ কর্ণের জীবনলিপি। মহাভারতের এই মহান ব্যক্তিত্ব 'প্রথম পার্থ' নাটকের নায়ক। তাঁর জীবন ও চরিত্রের কিছুমাত্র পরিবর্তন না করে নাট্যকার এখানে কর্ণকে আরও বর্ণময় করে তুলেছেন। কুন্তীর প্রতি অন্তরের টান, দ্রৌপদীর থেকে পাওয়া প্রত্যাখানের বেদনা, দুর্যোধনের বন্ধুত্ব রক্ষা, অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ের আকাঙ্খার পাশাপাশি পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহ এখানে কর্ণকে পূর্ণতা দান করেছে। এই যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জেনেও যোগ্য বীরের মত কর্ণ যুদ্ধের সিদ্ধান্তে অবিচল থেকেছে। কৃষ্ণ যখন তাঁকে তাঁর শেষ-মুহূর্তের সঙ্গে

পরিচয় করিয়েছেন, কর্ণ তখন জেনেছেন অর্জনের হাতে তাঁর পরাভব সম্ভব নয়, তাঁর পরাজয়ের জন্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করতে হবে ছলনার। কৃষ্ণ যখন তাঁর দার্শনিক প্রতীতি কর্ণের কাছে ব্যক্ত করেন তখন কর্ণের একটাই চাওয়া থাকে- 'তবে আশীর্বাদ করো, আর যেন ফিরে না আসি।' কর্ণের এই সান্ত্বনাহীনতা এই বিষাদের মধ্যে দিয়ে ধ্বনিত হয় আধুনিক মানুষের অসহায় আর্তনাদ।

মহাভারতের কাহিনীকে আধার করে বুদ্ধদেব বসু রচিত শেষ মৌলিক কাব্যনাট্য 'সংক্রান্তি', রচনাকাল ১৯৭০ সাল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অষ্টাদশ দিনে, দুর্যোধনবধের পটভূমিকায় ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর মনস্তত্ত্ব এখানে পরিস্ফুট। গত সতেরোদিনের যুদ্ধের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র, তাঁর পিতৃহৃদয় শোকে কাতর হয়েছে অনুক্ষণ। সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি দিয়ে ভীম ও দুর্যোধনের যুদ্ধের বর্ণনা করেছেন, পুত্রের প্রতি আঘাতের কথা শুনতে শুনতে ক্ষভে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়েছেন ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্রর অন্ধ পুত্রস্নেহ, পুত্রদের প্রতি গান্ধারীর যুগপৎ ঘৃণা ও অপরিমেয় স্নেহের অপূর্ব মেলবন্ধন এই কাব্যনাট্যটি।

ধর্মপ্রাণা গান্ধারী জানতেন তাঁর অর্ধমাচারী পুত্র অন্যায় ও হীন কর্মে লিপ্ত থেকে মানসিক অর্থে অনেক আগেই মৃত, আজ তাঁর শারীরিক মৃত্যু হল। তাই তিনি ধর্মের জয় দিয়েছেন। কিন্তু অর্ধমাচারী পুত্রকে ঘৃণা করার পাশাপাশি তাঁর মাতৃহৃদয়ের শোক প্রকাশ পেয়েছে দুর্যোধনের মৃত্যুতে। পরম স্নেহে গান্ধারী আহ্বান জানান - "বাছা, ফিরে আয়। ফিরে আয় শিশু হয়ে আমার কোলে-", করুণ প্রার্থনা করেন ধৃতরাষ্ট্রর কাছে 'যদি পারো, আরো একটি পুত্র দাও আমাকে'। নাটকের শুরুতে ধর্মের জয় কণ্ঠে নিয়ে গান্ধারীর আগমন ঘটলেও নাট্যকার শেষ পর্যন্ত তাঁকে রক্তমাংসের মাতৃরূপেই এঁকেছেন। অন্যায় আচরণের জন্য যে পুত্রকে মা সুতীব্র ঘৃণা করেছেন সেই পুত্রের মৃত্যু সহ্য করা তাঁর পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। জীবনধর্মের বশবর্তী হয়ে গান্ধারী পুত্রের মৃত্যুতে বিচলিত হয়ে পড়লেও তিনি ঘটনার অমোঘতাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। তিনি জানেন, প্রতিটি জীবের জন্মের লগ্নেই থাকে মৃত্যুর পরোয়ানা, তবুও 'জীবিতেরা সর্বদা মৃত্যুর ভয়ে অস্থির।' মৃত্যু মানে জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, যাবতীয় কোলাহল থেকে মুক্তি। তিনি জানেন জীবনের ধারাবাহিকতায় জন্ম-মৃত্যু বলে কিছু নেই, আছে এক মুহূর্তে মিলিয়ে যাওয়া। তিনি জন্ম-মৃত্যুর সম্যক জ্ঞান উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই অন্তিম শয়নে শায়িত পুত্রকে আশীর্বাদ করেছিলেন - 'পুত্র, তুমি অনেক যুদ্ধ করেছ, এখন নিদ্রা যাও, অনেক অশান্তির পর শান্তি হোক তোমার।' ন্যায় হোক বা অন্যায়, দুর্যোধনের পুরো জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই কেটেছে। বেঁচে থাকার জন্য, রাজা হওয়ার জন্য দুর্যোধন অনেক সংগ্রাম করেছেন। অবশেষে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সমস্ত ভাই-বন্ধুর জীবনলীলা সমাপ্তির মত হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের সাক্ষীও হতে হয়েছে তাঁকে। জীবন সংগ্রাম, যুদ্ধের শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি তাঁর দূর হয়েছে এই শান্তিময় মৃত্যুতে। এই মৃত্যুই আনে মানুষের ইতিহাসে ক্রান্তিকাল। নাট্যকার দুর্যোধনের মৃত্যুতে অনুভব করেছেন মানুষের ইতিহাসের সংক্রান্তি। জীবন কাম্য হলেও তার অন্তে মৃত্যু অবসম্ভাবী। কখনো কখনো এই মৃত্যু বেঁচে থাকার চেয়ে বেশি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। জীবনের দ্বন্দ্ব, ব্যর্থ সংগ্রামের যন্ত্রণা থেকে মৃত্যুর শান্তি যেন বুদ্ধদেবের নাটকের পাত্র-পাত্রীদের উজ্জ্বল উদ্ধার।

'মহাভারতের কথা' গ্রন্থের ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু বলেছেন –

"মহাভারত কোনো সুদূরবর্তী ধূসর স্থবির উপাখ্যান নয়, আবহমান মানব জীবনের মধ্যে প্রবহমান।"[৪]

মানবজীবনের মূলেই হচ্ছে সংগ্রাম, তাই বুদ্ধদেবের কৃষ্ণ বলেন 'দ্বন্দ্ব ছাড়া জীবন গতিহীন'। জীবন-যাপনের জন্য প্রতিটি মানুষকে সচেষ্ট ও উদ্যোগী হতে হবে। জয় বা পরাজয় দুই-ই তুল্য-মূল্য। এক-একটি যুদ্ধের পর কালসন্ধ্যা আর সংক্রান্তি অবসম্ভাবী। এটিই কালের প্রবহমানতা। মানব ইতিহাসের এই মহাকাব্য মহাভারত এভাবে আবহমান কাল ধরে গৃহীত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেই মহাভারতকে দেখেছেন। পৌরাণিক চরিত্রাবলীর জীবনালেখ্য, দ্বন্দ্ববেদনা আধুনিক মানসিকতায় পরিপুষ্টি লাভ করে তাঁর কাব্যনাটকের অন্বিষ্ট বিষয় হয়ে ধরা দিয়েছে। সব মিলিয়ে কাব্যনাটকগুলি জগৎ ও জীবনের এমন এক বোধের স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে যা সম্পূর্ণ আধুনিক। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে তাই

নিছক বর্তমান থেকে দূরবর্তী, অতীত যুগের মানুষরূপে দেখলে ভুল হবে, অন্তর্গত পরিচয়ে তারা সমকালীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিরকালীন হওয়ার আবেদন রাখে।

Reference:

১. সরকার, রাজীব, বহুমাত্রিক বুদ্ধদেব বসু : বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে, কথাপ্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৫২
২. দে, অপূর্ব (সম্পা.), তপস্বী ও তরঙ্গিনী পুরাণের নবভাষ্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১১, পৃ. ২৫
৩. বসু, বুদ্ধদেব, কালসন্ধ্যা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ভূমিকা
৪. বসু, বুদ্ধদেব, মহাভারতের কথা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৮